থিয়েটারের মাচায়

অসিত বসু

বাংলা থিয়েটার এবং তার প্রযোজনা সংক্রান্ত সুবিধে-অসুবিধে-অবস্থিতি—এইসব প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার নিরিখ জানতে চেয়ে আপনারা আমায় কিছু লিখতে বলেছেন। সত্যিকথা বলতে কি—এ হেন সম্মান আমা হেন একজন অতি নগণ্য নাট্যকর্মীর উপযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে আমারই ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ কোনও সরকারি-বেসরকারি খেতাব-পুরস্কার-অনুদান স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কৃতী পুরুষ আমি নই। তবুও আপনারা আমার অভিজ্ঞতার কথায় আপনাদের মূল্যবান পত্রিকার পাতা ভরাতে একান্ত বদ্ধ-পরিকর এই দুর্মূল্যের বাজারেও। অনেক কৌশলেও তা এড়াতে অক্ষম হয়েছি। তাই এই লেখা লিখতে গিয়ে বেশ সঙ্কোচ এবং বলতে কি ভয়ও পাচ্ছি মনে-মনে। কারণ এ ধরনের লেখা আমাকে কোনও দিন লিখতে হতে পারে ভেবে—সেই ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই প্রায় কলেজ থেকেই থিয়েটার আন্দোলনে সব ছেড়ে ঝাঁপ দিইনি। নিতান্তই একটা বুক মোচড়ানো-টানের অনুভূতিই আমাকে এনে দিয়েছে থিয়েটারের 'মাচা'য়। এটা না করলে থাকতে পারব না—দম বন্ধ হয়ে যায়—তাই থিয়েটারকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। অনেক বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা স্বীকার করে নিয়েই। থিয়েটার আমার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার খোলা আকাশ। আজ যখন এই লেখা লিখছি—আমার সে-আকাশ প্রায় কেড়ে নিয়েছে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ। আমার সেই নির্মল নীল আকাশ বড্ড ঘোলাটে। হয়ত বা বয়সের এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধোঁয়াশায় আমারই দৃষ্টিভ্রম! থিয়েটার প্রযোজনা—বিশেষত আমি যে ধরনের থিয়েটার অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার করেছি, তার প্রযোজনা সংক্রান্ত আলোচনায় [১] দল, অর্থাৎ গ্রুপ এবং তার সাংগঠনিক রূপ, [২] নাটক, [৩] অভিনয়-অভিনতা, [৪] প্রয়োগগত কলাকৌশল আর কুশলীবৃন্দ এবং সর্বোপরি [৫] আদর্শ-নান্দনিক দার্শনিক তথা রাজনৈতিক—এসব প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। পড়েই। অবধারিত। যেহেতু স্বভাবগতভাবে আমি ঠিক 'গোছানে' নই—তাই আমার এই আলোচনা সাল তারিখের নিরিখ নিয়ে মাথা ঘামাব না কিংবা বিষয় ধরে-ধরে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আর্য-আলোচনায় নিমগ্ন হব না! আমার নিজের কাজের গণ্ডিতে থেকে দেখা, অনুভব করা নানা গল্পেসল্পে যতটা পারি এগোবার চেষ্টা করব।

নিজের থিয়েটার-টা শুরু করেছিলাম সেই ১৯৭১ সালে সি পি এ টি (ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটারে) গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা থেকে। শুরুরও একটা শুরু থাকে—

যেটা একটু না বললে শুরুর কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয়, তাই একটু পূর্ব-কথনে যাই।

বড় থিয়েটার—নিয়মিত থিয়েটারে নিজেকে সঁপে দেওয়ার শুরু সেই ১৯৬৬-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। তার আগে কলেজে এবং সমরুচির বন্ধুদের গড়া নাটকের দলে অভিনয় তারপর 'চতুর্মুখ'-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'মুকুর' গোষ্ঠীতে নাট্যচর্চা ইত্যাদি চলছে সেই '৬২/'৬৩ থেকেই। যে কথা হচ্ছিল—সেই '৬৬-র শেষের দিকে কলেজ থেকে বন্ধুবর শৈবাল মিত্র আমায় ধরে নিয়ে যান এল টি জি-তে। তখন "কল্লোল" "অজেয় ভিয়েৎনাম"-এর দিক কাঁপানো স্বর্ণযুগ। নিনার্ভা থিয়েটার তখন আমার মতো তরুণদের দিশারী—সমাজ-রাজনীতি সচেতন থিয়েটারের মূর্ত প্রতীক এল টি জি, উৎপল দত্ত তখন আমাদের মহানায়ক!—সেসময়ের সমাজ-রাজনীতির পটভূমিও উত্তাল উদ্বেল—'৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সামনে ৬৭-র নির্বাচন;—বাম শিবিরও সদ্য বিভাজিত মতাদর্শের যুদ্ধে। আই পি টি এ তখন সেভাবে সক্রিয় নয়। উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, চিত্ত পাল, বিদ্যুৎ বসুদের নেতৃত্বে পি এ এফ (পিপলস আর্টিস্টস ফেডারেশন) গণশিল্পী সংস্থা মিনার্ভাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পি এ এফ কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের পোস্টার নাটক "দিন বদলের পালায়" আমাকে পাঠানো হল এল টি জি থেকে—নাটকে পোশাকের অভিনয় এবং যুগ্ম মণ্ডাধ্যমা হিসাবে। হঠাৎ যে কেন উৎপলদা তথা অভিজ্ঞ কমরেডদের স্নেহের চোখে পড়ে গেলাম জানি না। তখন একটা অন্য মেজাজ আমার! তাপস সেন, নির্মল গুহরায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শক্তি নাগ, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ আমার স্বপ্নের মানুষদের সঙ্গে কাজ করছি। আমায় আর পায় কে, জীবনের প্রথম এবং একমাত্র চাকরি ছেড়ে দিলাম থিয়েটারের সর্বক্ষণের কর্মী হব বলে। আসলে তখন ২৩/২৪ বছরের উদ্দাম যৌবন লাভক্ষতির অঙ্ক জানেনি, মানেনি। কীভাবে চলবে, ভবিষ্যত কী? এসব চিন্তা মাথাতে আসেনি। জোয়ার এসেছে—পাল তুলে দাও—ব্যাস! এটা শুধু আমার নয় সে সময়ের অনেক যৌবনই উত্তাল জোয়ারে—রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং থিয়েটারের প্রতি আকুল প্রীতির ষাঁড়াষাড়ির বানে সব তুচ্ছ করে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে, পিছুটান না রেখে। একমাত্র লক্ষ্য ছিল—নিজেদের আদর্শ অথবা স্বপ্নের কূলে পৌঁছনো। কতজন হারিয়ে গেছেন, কেউ বা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পৌঁছেছেন—কেউ-কেউ বা ক্লান্ত শরীরটা কূলে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। আজ পেছন ফিরে যখন ভাবি, তখন মনে হয়, ওই দুর্দম জেদটুকুই সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রতি পবিত্র নিষ্কলুষ ক্রোধ এবং ঘৃণার আগুনটুকুই ছিল সেই সময়ের যৌবনের প্রাণ। তখনও সেই উষ্ণ প্রাণের উত্তাপ কম্পিউটারাইজড নির্ভুল লাভ-অলাভের শীতল অঙ্কের নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় জমে বরফ হয়ে যায়নি। আজকের অনেকে হয়ত কথাগুলো পড়ে বিরক্ত হবেন, হওয়া উচিতও, তবু আমি অসহায়, আমার ওই মতটাকে নাকচ করতে পারছি না। পারলে সবচেয়ে

সুখী হতাম। যাইহোক ঘটনায় ফিরি, "দিন বদলের পালা" হল। আর ক্রমশ দিন বদলাতে-বদলাতে একেবারে আমূল বদলে গেল। সেই বদলের রক্তাক্ত অগ্নিগর্ভ নাটকে কত মুখ—কত মানুষ—কত ঘটনার ঘনঘটা। যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম—জরুরি অবস্থা, ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি, ডিভ্যালুয়েশন, রাজনৈতিক রি-ভ্যালুয়েশন, এ পক্ষ থেকে ও পক্ষে তাঁতের মাকুর মতো সতত সঞ্চরমান নেতা এবং দাদার দল—কাঁটাতারে ঘেরা কলকাতায় কোমিং অপারেশন—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—যেন একটা বিশাল কেলাইডোস্কোপ অনির্বার গতিতে ঘুরেই চলছে আর প্রতিমুহূর্তে জটিল থেকে জটিলতর নক্সা ফুটিয়ে তুলছে। আমারও চোখ একটু-একটু করে ফুটছে-ফুটছে-ফুটছে—আর মনের পরতে-পরতে অভিজ্ঞতার চর জাগছে—জেগেই চলছে। এত কথা এল শুধু শুরুতে পৌঁছতে। যে কথাটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে, কোন সময়ে কোন মানসিক বৃত্ত থেকে আমার যাত্রা শুরু। উৎপলদার কাছে, উৎপলদার থিয়েটারে নিজেকে তিল-তিল করে—ওয়ার্ডরোব বয় থেকে শুরু করে থিয়েটারের সবরকম কাজ নিজের হাতে করে নিজেকে গড়েছি। আর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার প্রতি উৎপলদার স্নেহ এবং অক্লান্ত শিক্ষা! এটা না পেলে আমি শূন্যে মিলিয়ে যেতাম। তবুও মতাদর্শ এবং নাট্যদর্শগতভাবে আমার মনে একটা স্বতন্ত্র থিয়েটার-বোধ ও অভিব্যক্তি গড়ে উঠছিল—যার ফলে আমি এল টি জি থেকে বিবেক-যাত্রাসমাজ হয়ে পি এল টি পর্যন্ত অনুসৃত পথ ছেড়ে সি পি এ টি-তে এসে পৌঁছই। সি পি এ টি শুরু হয় চেকভের সীগাল নাটকের অজিত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত বাংলা অনুবাদ "আকাশ বিহঙ্গী" দিয়ে, তারপর জ্যোতিঠাকুরের "অলীকবাবু", মোহিত চট্টোপাধ্যায় কৃত ক্লীমেন্সডেন অনুসরণে "শেকসপীয়র" এবং তাঁরই লেখা "বাঘবন্দী" নাটক। এই সমস্ত নাটকেই কর্মের নানারকম মজার খেলা ছিল। যেহেতু দীর্ঘদিন উৎপলদার ছত্রছায়ায় কাজ করেছি, তার অপ্রতিহত প্রভাব কাটাতে প্রায় ইচ্ছে করেই এই ধরনের প্রযোজনাগুলিতে মকশো করতে হয়েছে নিজের সিগনেচার ঠিক করতে। অলীকবাবুর পাপেট থিয়েটারের ভঙ্গি আকাশ বিহঙ্গীর প্রয়োগে আংশিক ন্যাচারালিস্টিক ঢঙ, শেকসপীয়রে খানিকটা এক্সপ্রেসনিস্ট ঠাট—কিংবা বাঘবন্দীর বায়োমেকানিজমের ঠমক—কখনও দর্শক সমালোচকদের ভালবাসা পেয়েছে, কখনও তিরস্কার। কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। বা কোনও একটা সাফল্যে মজে যাইনি। আমরা যে সমমনস্ক বন্ধুরা এই থিয়েটারটা করতাম, আমাদের লক্ষ্যই ছিল—নিত্যনতুন ফর্ম এবং কনটেন্ট নিয়ে গবেষণাগারের কর্মীদের মতো নতুন থিয়েটারের ভাষা খোঁজা। '৭১-'৭২ এই চলতে থাকল। তখন সংগঠন এবং প্রয়োজনা বিভাগ একাত্ম হয়ে কাজ করছে। আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে সি পি এ টি তথা আমাদের থিয়েটারটাকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদই ছিল বেশি। কেউ সবে চাকরিতে ঢুকেছে, কেউ সবে পড়াচ্ছে কলেজে, কারুরই অর্থনৈতিক অবস্থাটা স্থায়ী চেহারা তখনও নেয়নি। তার ওপর আমরা দু একজন থিয়েটার ছাড়া কিছুই কীনি না! বড়জোর কোনও প্রযোজনার জন্য সেট

করে দিই। যৎসামান্য হাত খরচ পাই। কিন্তু দলের ডিসিপ্লিন ছিল যাকে বলে স্পার্টান ডিসিপ্লিন। সাড়ে ছটায় রিহার্সাল থাকলে ছটা একত্রিশে কেউ ঢুকছে ভাবতে পারা যেত না! এমনও হয়েছে, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কোমর সমান জল, আমরা দু-একজন যারা আগে এসেছি ভাবছি আজ বোধহয় আর কেউ আসবে না। কিন্তু অবাক কাণ্ড ছটা ত্রিশের মধ্যে কাকভিজে হয়ে সবাই উপস্থিত। তখনও কলকাতায় ট্রাফিক জ্যাম হতো, মিছিল-মিটিং থাকত—হয়ত এখনকার চেয়ে বেশিই। জ্বরজারিও হতো, কিন্তু গ্রুপের রিহার্সালে দেরিতে আসা কি না আসা, তৎসংক্রান্ত কোনও অজুহাত—পাইনি। ছিল না। এখন মাঝে-মাঝে ভাবি, সে সর্বদম গেল কোথায়! কেন থিয়েটারের ছেলে-মেয়েদের মন থেকে সেই নিবেদন, সেই একাগ্রতা হারিয়ে গেল? হয়ত কারণ আছে, বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন, কিন্তু পরিস্থিতির এই তফাতটা অস্বীকার করার পথ নেই। ইদানীং গ্রুপথিয়েটারের কাজ করতে গিয়ে পদে-পদে হোঁচট খাই মহলার রুটিন ঠিক করতে। কারুর ব্যক্তিগত, কারুর সামাজিক, কারুর বা সাংস্কৃতিক, নানান কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সদস্যদের উপস্থিতির কথা ভেবে, জটিল গাণিতিক হিসাব মাথায় রেখে, মহলার নির্ঘণ্ট রচনা করা পাকা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এরও সাধ্য নয়। আমাদের সময়কার যাঁরা এখনও থিয়েটার করে যাচ্ছেন তাঁদের কাছে এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে জানলাম, এটাই নাকি সাম্প্রতিক কেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই ভুগছেন এহেন ভাইরাসের আক্রমণে। হলে কী হবে, এ-কেতায় নিজেকে দুরন্ত করে উঠতে পারছি না। ফলে মানসিক আঘাত সইতে হচ্ছে। একটা গ্রুপ থিয়েটার করছি, কোনও আদর্শে (সে রাজনৈতিক এবং শিল্পের আদর্শ যাই হোক না কেন) উদ্বুদ্ধ হয়ে, নিজেদের বিশ্বাসের আদর্শ থিয়েটারকে তান্নিষ্ঠ চর্চায় সুষ্ঠ প্রকাশনার জন্যে সেখানে মহলায় আমার পার্টের অংশটুকু ছাড়া আমি উপস্থিত নেই। অবাক কাণ্ড! আমি যে কর্মকাণ্ডের সমগ্রের অংশমাত্র, সেই সমগ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই, কেবল আমার আংশিক সংযোগে তাকে পূর্ণ করব, এটা একটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা ছাড়া কিছুই নয়। সকলে সব সময় থিয়েটারি কর্মকাণ্ডটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে না থেকে, সেই প্রার্থিত প্রযোজনাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যদি জড়িয়ে না থেকে তাকে আগলাই বা তার ভাল-মন্দ না ভাবি, তাহলে প্রযোজনাটির সঙ্গে আমার মনের আঁট বাঁধে কেমন করে! কাঠবেড়ালির নুড়িটি যত ছোটই থেকে যাক, সেটি বিহনে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন অসম্পূর্ণই থাকত! অতএব সকলের ওই ঐকান্তিক সম্মিলিত ঘাম ঝরানো বিনে প্রযোজনার সার্থকরূপ পাওয়া সম্ভব না। না রূপে, না ভাবে। সে সময় আমরা সকলে থিয়েটারের হোলটাইমার হতে না পারলেও থিয়েটারের জন্য ডেডিকেশন এবং প্রচেষ্টার গভীরতা বা ভাবনার এককেন্দ্রিকতায় পার্টটাইমার ছিলাম না। ইদানীং রেওয়াজ দেখি এক অভিনেতার বহুদলে অভিনয়। এর মধ্যে নিশ্চয় ভাল বা লাভজনক কোনও দিক আছে নচেৎ এই অ্যাটিটিউডের প্রকোপ দেখা যাবে কেন? ব্যক্তিগতভাবে আমি

এটাকে মন্দ বলেই ভাবি। সম্পূর্ণ পেশাদার অভিনেতারা পেশাগতভাবে বিভিন্ন পেশাদার অভিনয়-মাধ্যমে একই সঙ্গে কাজ করছেন, এটা মানতে কোনও অসুবিধা নেই। একজন শিল্পী পেশাগত কারণে বিভিন্ন পেশাদার স্থানে তাঁর দক্ষতা বেচতে পারেন বা ভাড়া খাটাতে পারেন সহজেই, কারণ সেই ব্যবসায়িক শিল্পকীর্তিগুলি যার-যার মতো আদর্শভিত্তিক। সেখানে তাঁর কাজ ভাড়াটে সৈনিকের। ভাবগত দিক থেকে বোধ হয় মানসিকভাবে ততটা ইনভলভড হবার সুযোগ কম। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলির তো কিছু আদর্শের ভিত্তি আছে। প্রত্যেকেই নিজের প্রকাশভঙ্গি এবং চেতনায় অনন্য। তা না হলে এত দল এত গোষ্ঠী কেন? সেই হিসাবে তাদের নিজেদের থিয়েটার ভঙ্গিতে সবদলই নিবেদিত প্রাণ। আদর্শ-উদ্বুদ্ধ। এক কথায় বলা যায় এক ধরনের পার্টিজান। সে ক্ষেত্রে এক দলের অভিনেতা বা পরিচালক অন্য দলে গিয়ে তাঁর এবং দলের শৈল্পিক বা দার্শনিক সাযুজ্য সংগতভাবে রক্ষা করতে পারবেন কী করে? সম্ভব? যদি তা সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি-শিল্পীর নিজস্ব দল এবং যে দলে কাজ করলেন এ-দুটির আদর্শ এবং প্রকাশভঙ্গি অভিন্ন। কিংবা নাম মাত্র ভিন্নতা আছে। সেক্ষেত্রে এ-দুটি দল এক হয়ে গিয়ে বলিষ্ঠতর, সমৃদ্ধতর নাট্য সংগঠন হওয়া উচিত। এখানে তা কিন্তু হয় না! আসলে হুজুগে মেতে, কতকগুলি বিরোধী আদর্শের জটলায় বাজার গরম রাখার ঝোঁক বোধহয় আমাদের থিয়েটারে এসেছে। হুজুগ না হলে ক্যালকাটা রেপার্টরির মতন সংগঠন (নামটা ঠিক লিখলাম কিনা জানি না। যাঁরা জার্মানি থেকে ফ্রিৎজ বেনেডিৎজকে আনিয়ে ব্রেখটের গ্যালিলিও নাটকের প্রযোজনা করে তুলকালাম করেছিলেন) অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ নাট্যরথীদের উপস্থিতিতেও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেন? এটা ভাববার কথা। আমরা কতটা আমাদের থিয়েটারের জন্য আর কতটা আমাদের নিজেদের আখেরের জন্য নিবেদিত প্রাণ? প্রসঙ্গে ফিরে আসি: এই যে দলে দলে ঘুরে-ঘুরে নাট্যচর্চার খেলা, এটাতে দলগুলিরই ক্ষতি হয় বেশি। যেহেতু একটু দক্ষ শিল্পীদেরই দল এভাবে বাইরে থেকে আনে, ফলে সেই শিল্পীর আর-আর সমস্ত কমিটমেন্টকে রক্ষা করেই দলকে নিজের রুটিন ঠিক করতে হয়। এর ফলে দলের অস্তিত্বের মূলে শেকড়ে চিড় ধরে। দলের মধ্যে দু-চারটি ডেডিকেটেড কর্মী থাকেন, হতে পারে তাঁদের হয়ত ক্ষমতা কম (আবার ক্ষমতাসম্পন্ন নট বা নাট্যকর্মী হয়েই তো সবাই আসেন না প্রথমটায়। পর্বে-পর্বে ক্ষমতার উন্মোচন হয়), বাইরের কারুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে দলের নিয়মানুবর্তিতার শৈথিল্য তাঁরা ব্যক্তিগত অসম্মান হিসাবে নেন—এটাই পার্টিজান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অসন্তোষ জমতে থাকে, অনেক অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাঝের থেকে কাজটা গোল্লায় যায়। এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে দীর্ঘকাল পরে যাত্রা থেকে ফিরে, অন্যদলের হয়ে নাট্য প্রযোজনা করতে গিয়ে। এই মানসিক অশান্তির ফলে আমায় "চরণদাস এম এল এ" এবং "নৌটঙ্কীলাল" নাটক সার্থক রূপায়ণ সত্ত্বেও তুলে নিতে হয়। কারণ সেই দলের পছন্দ আমার সঙ্গে মেলেনি। অথবা উল্টোটা। এর জন্যেই আমি শুরুর থেকেই আমার নিজের দলের

ছেলেরা, যত কমই ক্ষমতা থাক, তাদের নিয়েই কাজ করেছি। ব্যর্থ বা হতাশ যে খুব একটা হতে হয়েছে তা নয়। যেহেতু আমাদের এখানে নাট্যাভিনয়ের বিষয়ে সুষ্ঠু কিংবা কাজ চালানো গোছের শিক্ষিত শিল্পীদল পাওয়া যায়নি, পাইনি। তখন যাদের পেয়েছি, তাদের নিয়ে কাজ করতে-করতেই নিজেকে তৈরি করার পর্বে যা-যা শিক্ষা পেয়েছি, বা চর্চা করে উপকৃত হয়েছি, তাই দিয়েই তাদের স্বর-প্রক্ষেপণ, উচ্চারণ, অঙ্গ-সঞ্চালন, নাট্যতত্ত্ব এবং তথ্য, নাট্যপাঠ এই সবের শিক্ষায় যতটা পারি শিখিয়ে তৈরি করেছি। তবে মাস্টারমশাইয়ের মতো ছড়ি হাতে ক্লাস করে না। হাল্কা মেজাজে, মহলার মধ্য দিয়ে। এইভাবে নাটক শেখাতে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী এক-জনকেই জানি, তিনি আমার শিক্ষক—উৎপলদা! কাজেই তাঁরই শিক্ষাদান পদ্ধতিটা আমি আমার মতো করে ভেঁজে নিয়ে ব্যবহার করেছি। সার্থকতাও পেয়েছি। নাট্যচর্চার সব ছাত্ররাই যদি তাদের শিক্ষকের গুণাবলি নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ চেষ্টা করত—যান্ত্রিক-ভাবে নয়, সজ্ঞান সপ্রতিভায়, তাহলে আমাদের নাট্যআন্দোলনের বড় উপকার হতো! মুশকিল হচ্ছে সেই পুরনো কথা : 'গুরু মিলে লাখে লাখ—চেলা নেহি মিলে এক।' সবাই জানুক বা না জানুক, বলতে উদগ্রীব, শুনতে চাওয়া বা শোনার ধৈর্য একেবারেই নেই। এটা বোধহয় সমকালীন অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক যুগের অবদান। সবাই বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি। কেউ কারুর কথা শুনতে চাইছি না, পরস্পরকে বুঝতে বা জানতে চাইছি না। সেই সাতের দশকের গোড়ার দিকে আমাদের সমকালীন থিয়েটার কর্মীদের মধ্যে দল-মত-বয়স নির্বিশেষে থিয়েটারকে মাঝখানে রেখে সহজভাবে মত বিনিময়ের সেই গভীর আড্ডাগুলি শ্যামবাজার কফিহাউস বা পবিত্রপাঞ্জাব কিংবা কফিহাউস ঘিরে গড়ে উঠেছিল। পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ এবং অভিজ্ঞতার লেন-দেনের একটা সত্যিকারের প্রাণের উত্তাপ ছিল। সেটা বোধহয় ইদানীং হারিয়ে গেছে। থিয়েটার কর্মী এবং সচেতন থিয়েটার-বোদ্ধাদের ওই আড্ডাগুলি আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। যা নিয়ে, যা সম্বল করে, অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটবার রসদ পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, অলোক মুখার্জি, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু থিয়েটারকর্মী আজ এখনও আমার কথাগুলির পক্ষে সাক্ষ্যদান করতে পারেন। এখন কোথাও এমন আড্ডা খুঁজে পাই না। পুরনো মানুষরা হয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নানা কাজে, আরও গুরুতর দায়িত্ব পালনে। কিন্তু নতুনরা কোথায়? যাঁরা এ থিয়েটারকে ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাবেন তাঁদের সেই পরস্পরকে জানা-বোঝার সম্মেলক আড্ডা দেখি না কেন? ভাববার কথা! এই রকম আড্ডায় মনের যন্ত্রণা প্রকাশের ছটফটানিতে রচিত হয়েছিল, "কলকাতার হ্যামলেট", সাতের দশকের সূচনার দামাল দিনগুলির নৃশংস থাবায় নিহত হলেন সত্যেনদা। সত্যেন মিত্র। থিয়েটার ওয়ার্কশপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, এক আদর্শনিষ্ঠ থিয়েটার কর্মীর প্রতিবাদহীন হত্যায়, প্ররোচিত হয়েছিলাম ওই নাটক লিখে প্রযোজনা করতে! ওই প্রযোজনাই সি পি এ টি-কে সাবালকত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর একের পর এক

রজত ঘোষের "নরমেধ", আমার লেখা "১৭৯৯" (এ নাটক আগে মিনার্ভা কর্মীসংসদ প্রযোজনা করেছেন আমাকে দিয়ে—১৯৭২, ৭ ডিসেম্বর বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তিযাপনের জন্য), নর্ম্যান বেথুনের জীবনী অবলম্বনে এক ডকুমেন্টারি থিয়েটার প্রয়াস "মৃত্যুহীন প্রাণ" প্রভৃতি ! এরপর ব্রেখটের "ককেশিয়ান চক সার্কল" (খড়িমাটির গণ্ডি) নাটকের সুদীর্ঘ মহলার পর—মঞ্চায়নের একদিন আগে থিয়েটারি দলীয় রাজনীতির বলিতে প্রযোজনাটির মৃত্যু ঘটে। আমিও সিপিএটি ত্যাগ করি। ১৯৭৫ সালে। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। ঘটনাটিতে নিহিত আছে আমাদের গ্রুপথিয়েটার আন্দোলনের সাংগঠনিক ভয়াবহতার একটি গভীর দিক।

"কলকাতার হ্যামলেট" থেকে আমি মোটামুটিভাবে নিজের মঞ্চ এবং নাট্যভঙ্গির একটি ভাষা, বা প্রকরণগত আঙ্গিক খুঁজে পেতে শুরু করি। ওই ভাষাতেই ঘুরে-ফিরে নানান ছন্দে লয়ে এতাবৎ আমার থিয়েটার করে গেছি, বা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওই প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকে আরও এগিয়ে নিতে গিয়ে কখনও হোঁচট খেয়েছি, কখনও সামান্য সার্থকতা পেয়েছি। এর সূচনা কিন্তু চোয়াড়বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত "১৭৯৯" নাটকের মিনার্ভা-প্রযোজনা থেকে। নাটক হিসাবে এটি অনেক কাঁচা, কাব্যিক কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাজা ভাব এবং বক্তব্যের সুষ্ঠ প্রকাশের আবেগতাড়িত আকুলতা একে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এর মধ্যে নাচ-গান-যুদ্ধ-আচার-সুর ইত্যাদির সংমিশ্রণ এবং নির্মল গুহরায়ের মঞ্চ গঠন, হেমাঙ্গদার সুর সব মিলে একটা অন্য ধরনের থিয়েটারের মাদকতা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অন্তত সর্বভারতীয় নাট্যসমালোচকদের লেখা এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটা আমার মনে হয়েছে। এই নাটকে কোনও নামজাদা বা অর্ধ-নামজাদা পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। বিভিন্ন গ্রুপের (স্বল্পখ্যাত বা তখন অখ্যাত) অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়েই এই নাটক প্রযোজিত হয়েছিল। নাটকটির বহু অখ্যাত শিল্পীই পরবর্তীকালে গ্রুপথিয়েটার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নাম হয়ে দাঁড়ান। আসলে আমাদের সেই পুরনো স্পার্টান ডিসিপ্লিনকে সবাই শেকল ভাবেনি। নিজের কর্তব্য বিধায় মন প্রাণ ঢেলে কাজ করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জনের বেশি শিল্পী এবং মিনার্ভার অনতিক্রম্য অভিজ্ঞ নেপথ্য মঞ্চকুশলীরা। যাঁরা যে কোনও দেশের মঞ্চের গর্ব বিবেচিত হতে পারতেন। কিন্তু এই পোড়া দেশে অনাহারে-অর্ধাহারে, অবহেলিত হয়ে যাঁরা একে-একে চলে গেছেন, যাচ্ছেন—মৃত্যুর দেশে ! অশ্বিনী সর্দার, তিনকড়িদা, সুধাদা, বড় কালীদা, কালাচাঁদ, রঙ্গু (বিখ্যাত মঞ্চ-সূত্রধর রঙ্গলাল শর্মা), শ্রীপতি দাস (ধ্বনি প্রক্ষেপক)—এঁদের মতন স্টেজ টেকনিশিয়ানরা জানি না এদেশে আর তৈরি হবে কি না। এঁদের অনেকেই আজ আর নেই। যতদিন থিয়েটারের সঙ্গে এতটুকু যোগ থাকবে, এঁদের স্মৃতি আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রেরণা জোগাবে।

"কলকাতার হ্যামলেট" থেকে আমার প্রযোজনার যে নবযাত্রা শুরু হয় সেই যাত্রায় কটি জিনিস আমি মঞ্চে চেষ্টা করে গেছি এবং যাচ্ছি। যেহেতু আধুনিককালে পারফর্মিং

আর্ট হিসাবে সিনেমা এবং অধুনা টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ দিয়ে অদ্ভুত গতিতে দৃশ্যাবলি এবং ঘটনাবলিকে উপস্থাপিত করে সমকালের জীবনের গতির দ্রুতির পরিপূরক হয়ে উঠেছে এবং দর্শক সাধারণ ওই গতিময়তায় অভ্যস্ত হচ্ছেন, হয়েছেন, কাজেই থিয়েটারের আকর্ষণে ওদের বাঁধতে গেলে ওই গতিময়তায় থিয়েটারকেও আনতে হবে। যেহেতু থিয়েটার জীবন নয়, জীবনের অনুকৃতি—রসাশ্রিত ভাবানুকৃতি, তাই ন্যাচারালিস্টিক বস্তুনিষ্ঠ সজ্জায় থিয়েটারের বাঁধা পড়া চলবে না! আভাসে, রঙ-মাত্রা-ছন্দে দৃশ্যকে ছায়ায়-আলোয় মায়াময় করে, মঞ্চে ঘটমান দৃশ্যের অন্তরের ভাবটিকে প্রকাশিত করে, নিমেষে ঘটনান্তর এবং দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া। সেই হিসাবে আলোর ভূমিকা এখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্যই এটা আমার প্রযোজনা-ভাবনার কথা বলছি। প্রায় চলচ্চিত্রের গতিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া। আমার এই ভাবনাগুলি কখনও মঞ্চে ঘটতে দেখতাম না, যদি প্রবাদপ্রতিম-অগ্রজতুল্য তাপস সেন আমা-হেন অর্বাচীনকেও তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ-সহানুভূতি এবং সক্রিয় সহযোগিতা না করতেন। তাপসদা শুরু থেকেই আমার ডাকে এসেছেন এবং যথার্থ আলো নাকি ছায়ার-মায়ায় আমার প্রযোজনাগুলিকে অর্থবহ করে তুলেছেন। এত দুর্যোগ দুর্দিন পার হয়ে এসে আজও যাঁরা আমাকে বা আমার থিয়েটার ভাবনাকে অম্লান বদনে আশকারা জুগিয়েছেন বা জোগাচ্ছেন, তাপসদা তাঁদের অগ্রণী। ওঁর ঋণ শোধ করা আমার কেন, আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। একটা অসামান্য আলোক-মুহূর্তের কথা বলি : "কলকাতার হ্যামলেট"-এর প্রেলুডে যখন মরণ থেকে জেগে ওঠা রক্তাক্ত অভী তার অতীতের কথায় ফিরে যাচ্ছে এবং ধীরে-ধীরে একটা 'Chime'-এর তালে-তালে তাদের মহলাদানরত সহকর্মীদের নিয়ে মহলা ঘরটা ভেসে উঠেছে—অভী এবং দ্বিতীয় মাতাল মঞ্চের এক্সট্রিম ডাউন লেফটে, আলো ওদের মুখে ধরা, বাকি মঞ্চের গাঢ় অন্ধকারে রাধা এবং অন্যান্যরা আপ সেন্টার রাইটে পজিশন নেয়। অভীর কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ওপর আলো নিভে আসে এবং একই সঙ্গে মহলার সঙ্গে রাধাকে সেন্টার করে মঞ্চের ওই অংশ আলোকিত হয়। এটা অনেকবার অনেক সিচুয়েশন, অনেক নাটকে দেখেছি। মিনাভায় হচ্ছে রিহার্সাল। নিটোল অপারেশন। তবুও তাপসদা হঠাৎ 'দাঁড়া দাঁড়া' বলে ছুটে এলেন! কী ব্যাপার? উনি একটা প্লাইউডের টুকরো নিয়ে একনম্বর লাইটপার্চে গিয়ে বললেন, 'ওই জায়গাটা আবার কর।' করা হল। একই অপারেশন। কেবল রাধাদের জোনের আলোটা আগেই অন করে প্লাইউডে ঢাকা। 'Chime'-টার তালের লয় ধরে ওই শুকনো কাঠের টুকরোটা উনি একটা সার্কুলার মুভমেন্টে নিচ থেকে ওপরে তুললেন। সেই একই আলো! কিন্তু ছায়াটাকে পর্দার মতন সরিয়ে যেন ময়ূরের পেখম ছড়ানোর মতো আলোটা ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হল মৃত্যুর অন্ধকার থেকে অভীর জীবন-নাট্যের ওপর পর্দাটা খুলে গেল, ঈশ্বরের জাদুকরী ছোঁয়ায়! অপূর্ব। শুধু এইটুকু মোচড়। একটা শুকনো কাঠে শিল্পীর ছোঁয়ায় ছায়ার মায়া। দৃশ্যটার শব্দ-অর্থ-রঙ-রূপ

মুহূর্তে চলে যায় অন্য স্তরে। এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে পরতে-পরতে। এই হলেন তাপস সেন। তাপসদার আলোকসম্পাত-সৃজন দেখা যে কোনও মঞ্চ-শিক্ষার্থীর জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই তো সেদিন (১৯৯০, অক্টোবর), আমার নিজের দল—'দেশকাল নাট্যমণ্ডলে' "মরশুমের একদিন"-এর প্রযোজনায় অন্ধকার নদীর বুকে নৌকা বেয়ে রাতের আঁধার পার হওয়ার দৃশ্য। একটু আগেই যে পাটাতনে যাত্রার দৃশ্য বা গুদামে যাবার রাস্তার দৃশ্য হয়েছে একটু আলোর মোচড়ে তা হয়ে ওঠে আঁধার নদীতে ভাসমান নৌকা। মাঝির গানের লয়ে নৌকা দুলতে-দুলতে চলে। পারের উঁচুতে দাঁড়িয়ে হ্যারিকেনধারী লোকেরা নৌকাকে বিদায় জানাচ্ছে। জলও নেই নৌকাও নেই, মঞ্চের পুনঃসংস্থাপনও নেই অথচ ফিল্মের গতিতে সমস্ত দৃশ্য এবং মুডের পরিবর্তন হয়ে যায়। আমাদের দেশে ভাল লেনস পাওয়া যায় না, আলোর উজ্জ্বলতা নড়বড়ে ভোল্টেজের জন্য সবসময় ঠিক রাখা যায় না, মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে অভিনয়ের ক্ষেত্রে সঠিক আলোক সংস্থাপনের নানান অসুবিধে। তা সত্ত্বেও অনেক ভাল-ভাল কাজ হচ্ছে—হয়েছে। এগুলি মানানসই ও মনোমতো হলে আরও ভাল হতো।

আমার প্রযোজনার ভাষায় আমি মঞ্চের হরাইজন্টাল প্লেনের সঙ্গে প্রসেনিয়ামের ভার্টিকাল প্লেনটাকে নানাভাবে খেলাতে চেয়েছি। এতে দৃশ্যগত একঘেয়েমি যেমন অনেকটা কাটে তেমনি চকিতে ফ্লোর লেভেল থেকে হায়ার লেভেলে দর্শকের দৃষ্টি সরিয়ে এনে এক ধরনের গতি নাট্য প্রযোজনায় আনা সম্ভব বলে মনে করি। তা ছাড়াও এই যে স্তরে-স্তরে ডাইনে-বাঁয়ে দর্শকের একাগ্রতা ভেঙে দিয়ে তাকে ফিজিক্যালি বিরক্ত করে নড়ানো—এর ফলে নাট্যের প্রসঙ্গে ইমোশনালি ডুবে যাওয়া থেকে দর্শকদের ঝাঁকি দিয়ে সচেতন রাখার একটা প্রয়াস পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবসময়েই চেয়েছি আমার প্রযোজনায় দর্শক কেবলমাত্র ইমোশনের দয়ে না মজে সচেতন বিচারক হয়ে বসে থাকুন।

কাঠের দাম ঊর্ধ্বমুখি। কাজেই নানারকমের পাইপ স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সস্তায় বাঞ্ছিত এফেক্ট তৈরির প্রয়াসও করা গেছে। তাছাড়া চট, পেপার পাল্প ইত্যাদির ব্যবহার। আমি প্রযোজনায় বাইরের অর্থ আনতে কোনওদিনই পক্ষপাতী নই। এর জন্য প্রযোজনার অর্থ সংগ্রহ করতে দলের সবার খুব কষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু প্রযোজনার প্রতিটি প্রকরণের সঙ্গে দলের সদস্যদের অধিকারবোধ এবং আত্মীয়তাও অনেক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। নাটকের প্রপার্টি, রিকুইজিশন ইত্যাদি আজও যতটা পারা যায় নিজেদের হাতে-হাতে গড়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ়মত পোষণ করি। এর ফলে গোটা সঙ্গতির বাধা অতিক্রম করতেও এই কৃচ্ছ্রসাধন অনেক নতুন-নতুন পথ এবং অর্থবহ সৃজন ঘটায় প্রযোজনায়। "রাংতার মুকুট" প্রযোজনায়—রাণা প্রতাপবেশী হাবিলদার ভাঙা ঝুল ঝাড়ার বর্শা কিংবা ভাঙা ছাতার তলোয়ার, ফেলে দেয়া বেতের চুবড়ির ঢাল কিংবা বাচ্ছাদের খেলনা ভূতের মুখোশের মুকুট এর

প্রকৃষ্টতম উদাহরণ! আমার "লোহার নূপুর" (১৯৭৬, ওয়ার্কার্স থিয়েটার), "রাংতার মুকুট" (১৯৮০, থিয়েটার ফ্রন্ট) "এ মহাজাগরণ" (১৯৮১ থিয়েটার ফ্রন্ট), "রঙের গোলাম" (১৯৮২, যান্ত্রিক), "হুকুমনামা" (১৯৮৩, যান্ত্রিক)-প্রভৃতি নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে আমার প্রয়োগতত্ত্বের নিদর্শন বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে আনা অনুদান অথবা এই জাতীয় সহজপ্রাপ্য অর্থ কোথাও না কোথাও সংগঠনের শিরদাঁড়ায় একটা চাপ দেয় যার ছায়াপাত ঘটে প্রযোজনায়। থোক টাকা কোথা থেকে আসছে বা আসবে এই চিন্তাটা দলের প্রোডাকশন চ্যালেঞ্জকে থিতিয়ে দিয়ে ভোঁতা আয়েসি করে। সত্যিকথা বলতে কী আমাদের এই প্রযোজনাগুলিতে অর্থের একটা ভূমিকা থাকলেও নিয়ন্ত্রক ভূমিকা যতদিন ছিল না বা নেই ততদিন এই থিয়েটার প্রাণময় থাকবে। তা নাহলে কোনও নাটকের সাকসেসের মোহে মজে দর্শকের পর দর্শক হিচড়ে নিয়ে গিয়ে চর্বিত-চর্বণ করা ছাড়া পথ নেই। তাতে প্রতিষ্ঠা বাড়ে বটে তবে প্রতিষ্ঠান প্রাণহীন হয়ে পড়ে। নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে যায়। একটা সাকসেস ভাঙিয়ে জীবন কাটাতে হলে গ্রুপ থিয়েটার কেন, ব্যবসায়িক থিয়েটার হোক! পয়সা ঢেলেছি কাজেই এই প্রযোজনা থেকে যতদিন পয়সা পাব তাকে চটকে খাই : এ মানসিকতা এবং ব্যবহার সেক্ষেত্রে দোষণীয় নয়। আমাদের গ্রুপ থিয়েটারেও আমরা অনেকেই বোধহয় এমত মানসিকতার শিকার হয়েছি। কাজেই আমাদের প্রাণ মরছে। তাছাড়া এই সাফল্যের মোহ একটা গ্রুপকে কীভাবে ধ্বংস করে বার বার দেখছি।

একটা গ্রুপ যখন ধীরে-ধীরে বড় হয়, তাকে ঘিরে অনেক মানুষ জড়ো হন। সংগঠনও তখন লোকবল এবং তজ্জনিত অর্থবলে বলীয়ান হতে চায়। ইতিমধ্যে গ্রুপের এক-আধটা প্রযোজনা যদি 'লেগে' গিয়ে থাকে তো কথাই নেই। কত রকমের মানসিকতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে যে অজস্র সদস্য হাজির হন তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা : এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ থাকেন যাঁরা প্রযোজনার কাজে ততটা আগ্রহী নন যতটা আগ্রহী সংগঠন পরিচালনার অন্যান্য বিষয়ে। অর্থকরী এবং সামাজিক সামর্থে প্রায়শই এই মাতব্বররা বেশ চৌকস এবং হাসি-হুল্লোড়ে অনেকেরই মনের মানুষ হয়ে ওঠেন এবং ক্রমশ এঁদের হাত ধরে নেতৃত্ব-বাসনা পূরণে আগ্রহী কিছু উঠতি আধা ক্ষমতার সদস্যরাও সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ফলে তখন মূর্তিটির চেয়ে চালচিত্র বৃহত্তর প্রাধান্য পেতে চায়। নিত্যদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে খটামটি শুরু হয়। দলের আসল কাজ অর্থাৎ প্রযোজনা চুলোয় যাক কে কত বড় মাতব্বর এবং দলীয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ সেটা প্রমাণ করতে এবং প্রযোজনার কর্ণধারকে হেনস্থা বা হেয় করতে আদাজল খেয়ে লেগে যান। ফলে দলের মধ্যে উপদলীয় কোঁদল, কাদা ছোড়াছুড়ি ইত্যাকার মধ্যবিত্ত কেচ্ছার ডামাডোলে নাট্যসরস্বতীর বিসর্জন ঘটে যায় অলক্ষ্যে। কিন্তু একটি দল থেকে সত্যিকারের পূর্ণক্ষমতায় যদি কোনও স্রষ্টার, থিয়েটারের নতুন দিকদর্শক কোনও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে তবে তাঁকে ঘিরে আর একটি নতুন দল গড়ে ওঠা থিয়েটারের পক্ষে স্বাস্থ্যকরই

মনে করি। পুরাতনের পক্ষচ্ছায়া থেকে নতুনের আগমন ঘটুক। স্বাগত জানাই। আর একটা অঘটন ঘটে—দলের পূর্ববর্তী কোনও হিট প্রযোজনা থাকলে কৌশলে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে ওই মডেলেই পরবর্তী প্রযোজনা হয়। কারণ ঝুঁকি কম। এইসব আনপ্রোডাক্টিভ ননপ্রোডাকশনাল অফিসিয়াল দাদারা একই সঙ্গে সাপের গালে এবং ব্যাঙের গালে চুমু খেয়ে বহু তন্নিষ্ঠ নাট্য সংগঠনের সুস্থ অস্তিত্বের বারো বাজিয়েছেন, এই ব্যক্তিরাই নাট্য আন্দোলনের কেশর ফোলানো উদ্দাম বুনো ঘোড়াটাকে 'ঝুঁকি', 'পুঁজি', 'সাকসেস' ইত্যাকার লাগামে বেঁধে প্রায় হিসেবি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী করে তুলতে পেরেছেন। সেই ধুরন্ধরপনার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখি কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে বলে আদর্শ-বিগর্হিতভাবে বিগলিত উৎবাহু নৃত্যে শামিল ডানাভাঙা কত ইকারুসকে। যারা সদম্ভে সূর্য শিকার করবে বলে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু ধুরন্ধর বিচক্ষণতার ভারে আজ বিদ্রোহী-উদ্দাম পক্ষ-বিধুনন ভাড়াটে পাখাবরদারের 'পাখা-নাড়া'য় পর্যবসিত। 'এ আমার-এ তোমার পাপ' আমরা সবাই মিলে তিলে-তিলে এই ভুল, এ অন্যায়ের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছি, আমাদের থিয়েটারের টানটান শিরদাঁড়াটাকে দয়ে মজিয়েছি। ফেরার উপায় আছে কিনা ভাবতে হবে। যদি পথ থাকে ফিরতে হবে। কীভাবে জানি না। সিরিয়াস ন্যাটকর্মীরা বসুন, সহনশীলতার সঙ্গে পরস্পরের মতামত বিনিময়ের পথ সন্ধান করুন। নইলে উত্তরকাল ক্ষমা করবে না। যেহেতু পূর্বকথিত ওই সব ক্ষমতালোভী দাদাদের প্রোডাক্টিভ কোনও ক্ষমতা নেই অথচ একটি সফল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হলে 'আমি অমুক দলের তমুক' বলে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে সমীহ এবং সুবিধা পাওয়া যায়। কাজের নেশায় কাছাখোলা গরিব থিয়েটার-করিয়েদের এরা বহু সর্বনাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এই সাংগঠনিক বিশেষজ্ঞদের থেকে সাবধান! এঁদের হাতে এবং এঁদের উপদলীয় চক্রের হাতে অনেকবার পেছন থেকে ছুরি খেয়েছি, এঁরা আমার অনেক রাতজাগা, রক্তঘামচোঁয়ানো চিন্তার ফসলে আগুন দিয়েছেন যার ফলে 'দল' বিষয়ে আমি খানিকটা যাকে বলে তিক্ত এবং অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। যদিও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, থিয়েটার তো আর একা করা যায় না। কিছু সঙ্গী মনের মতন অর্থাৎ কিনা সমমনস্ক সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। চার-পাঁচজন একসঙ্গে হলেই তো একটা দল। দল সম্পর্কে আমার এই মানসিকতা। যে কারণে যখনই যে-দলে পেছন থেকে টান অনুভব করেছি, হাত জোড় করে পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছি। থিয়েটার করাটাতে আমার অতলান্ত আগ্রহ আছে, দলের খুঁটি শক্ত করে বিখ্যাত হবার বিন্দুমাত্র বাসনা পোষণ করা, সেই ৭৬-এর সি পি এ টি ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই মুছে ফেলেছি। আমার থিয়েটার পরিক্রমা: 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার', 'থিয়েটার ফ্রন্ট', 'যান্ত্রিক' 'থিয়েটার ক্যাম্প' কোনও ঘাটেই নোঙর বাঁধিনি। প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা। শুধু থিয়েটারকে প্রতিমুহূর্তে নতুন করে পাওয়ার নেশা। পেশার টানে যাত্রা-টিভি-সিনেমা-ইত্যাদি মাধ্যমগুলিতে কাজ করেছি, করি। কিছু অর্থ এবং নামও পেয়েছি, পাই। কিন্তু মন

পড়ে থাকে সেই রামকেষ্ট ঠাকুরের গল্পের নষ্ট মেয়েটির মতো—মুড়ি ভাজছে গরম খোলায়, স্তন দিচ্ছে সন্তানকে, কিন্তু মন পড়ে আছে খিড়কির দোরে, কখন তার নাগর পুরুষ ইশারা করে। ঘুরে ফিরে সব মাধ্যমগুলি থেকেই টুকে-টুকে রোজগার করে রাখি থিয়েটারের জন্যে কিছু প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা। আমার থিয়েটারকে, কী করে তা সাজাব কিংবা থিয়েটারে আদৌ সেটা সাজে কিনা? কটা শো হবে ভাবি না। রিহার্সাল তো হবে? প্রতিটি রিহার্সালের মুহূর্ত আমার নতুন-নতুন সাজের নতুন-নতুন থিয়েটারি অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির আলো। এর মৌজ যিনি না পেয়েছেন তাঁকে বোঝানো যাবে না। এ বড় মজার খেলা, মজবার নেশা! আদৌ প্রেক্ষাগৃহ পাব কিনা জানি না, পেলেও ক'দিন কীভাবে জুটবে জানি না, কারণ দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে গ্রুপ থিয়াটরের হালহকীকৎ-আদাবৎ-রেওয়াজ এত বদলে গেছে এ বয়সে তার সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারব কে জানে। এই তো বছরখানেক আগে আকাদেমি মঞ্চে, যে মঞ্চ এক সময় আমার সর্বক্ষণের ঠাঁই ছিল, সেখানে প্রেক্ষাগৃহ পাবার কথা বলতে গিয়ে প্রশাসকমহাশয় স্পষ্ট বলে দিলেন 'নতুন লোকদের হল দেবার অসুবিধে আছে।' বসতে বলার সৌজন্যও দেখায়নি। এখন আমায় প্রমাণ করতে হবে আমি নতুন নই, পুরনো। কীভাবে প্রমাণ করতে হয় জানি না। তবে খালেদদা ঘটনাটা শুনে হেসে বলেছিলেন, 'এক কাজ করো জামা কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে, চুল উস্কোখুস্কো করে ধুলোবালি মেখে তাঁর সামনে হাজির হও। বলো—এই দেখুন আমি কতো পুরনো।' সত্যি এছাড়া আমার প্রাচীনত্ব কিংবা পুরনোত্ব ও থিয়েটারি যোগ্যতা প্রমাণ করার পথ কই? থিয়েটার বলতে আমি বুঝি প্রসেনিয়াম থিয়েটার। সেই থিয়েটারের আদ্যোপান্ত চর্চা করেছি এতকাল ধরে, তা একটা প্রসেনিয়াম মঞ্চ সময়মতন হাতে না পেলে নিজের থিয়েটারটার যোগ্যতা প্রমাণ করব কী করে। খোলামাঠের থিয়েটার অন্য থিয়েটার। তার প্রকরণ এবং কিছু কিছু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকলেও সে আমার নিজের থিয়েটার কই? আমার থিয়েটারের ফ্রেমটায় আলো চাই, অন্ধকার চাই, মঞ্চপরিকল্পনায় নানান স্তর চাই, উইংস চাই, পর্দা চাই, ফ্লাই চাই, লাইট পার্চ চাই, সাউন্ড পার্চ চাই—সেই ছয়ের দশক থেকে যাতে অভ্যস্ত কাঠ চট লোহা রং সব মিলিয়ে নেপথ্য মঞ্চের প্রাণশৈলে করা যে সোঁদা গন্ধ সেটা চাই। হাউস না পেলে হল না পেলে কোথায়, কোথায় পাবো এসব? বছর দুই আগের কথা, কলকাতার সরকারি এক হলে নিয়মানুগ আবেদনের পর আবেদন করেও হল না পেয়ে কর্মকর্তাদের কাছে হাজির হলুম সশরীরে: 'কী মশাই, হল দেন না কেন?' ভদ্রলোক আমায় অনেকদিন থেকেই চেনেন, ভোলেনও নি, কাজেই পুরাতনত্বের প্রমাণ না চেয়েই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—'আপনার হল পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি শুধু একবার মহাকরণে গিয়ে অমুকবাবুর সঙ্গে কথা বলুন।' মনটা ধনুকের ছিলার মতোন টান হয়ে উঠল ক্ষোভে, দুঃখে, বিতৃষ্ণায়। ফৈজ আহমেদ ফৈজের কবিতা মনে পড়ে গেল:

ইয়ে দাগ দাগ উজালা ইয়ে সব গুজেদা সহর,

জীসকে ইন্তেজার মে থা ইয়ে বো সহর তো নহী
ইয়ে বো সহর তো নহী জিসকে আরজু লেকে
চলে থেইয়ার সাথ সাথ
জো মিল জায়ে গী ক'হী ন ক'হী।'

এই আধা আলো-আঁধারির খাপছাড়া ভোর, যে উজ্জ্বল ভোরের প্রতীক্ষায় ছিলাম এ তো সে ভোর না ; এ তো সেই প্রভাত নয়, যার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে বন্ধুরা একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলাম যাকে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাব বলে।

"দিন বদলের পালা" থেকে পরিক্রমা শুরু করে পঁচিশ বছর পরেও যখন নিজের কানে শুনতে হল হল প্রাপ্তির জন্য ধর্না দিতে হবে মহাকরণে, চমকে উঠি দিন কি তাহলে বদলেছে? এ কেমন বদল। নাই বা করলাম থিয়েটার। আমি না করলে নাট্য-আন্দোলনের চাকা থেমে যাবে না কিন্তু, আমার অহং বা আত্মমর্যাদা বোধ বজায় থাকবে। একেবারেই মধ্যবিত্ত মানে বাংলায় থাকে বলে পাতিবুর্জোয়া ভ্যানিটি। শুধু আমি আমি এবং আমি। আদি-মধ্য-অন্ত-সবটাই আমি। অস্বীকার করে লাভ কি! আমরা পাতিবুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত মধ্যচিত্ত ত্রিশংকুরা শুধু ভান করে গেছি, যাচ্ছি যে সাধারণ জনগন, তথা খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য থিয়েটার করছি। সত্যিই কি করেছি? করছি? তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের এই থিয়েটারের স্থান কী! নিজেদের মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, দীর্ঘ ১৪ বছর যাত্রায় অভিনয়ের সুবাদে গ্রামেগঞ্জে, হাটে-মাঠে ঘুরেছি, আমাদের জনগণের জন্য করা থিয়েটার সেখানে নেই। তারা মনোপলিস্ট ব্যবসাদার মালিকদের প্রযোজিত যাত্রা বা বায়োস্কোপের শিল্পী সমন্বয়ে ওয়ান ওয়ালের জগাখিচুড়ি দল বেঁধে দেখতে ছোটেন, আমাদের এ-থিয়েটার সেখানে যথাযোগ্যভাবে পৌঁছয়নি। যদি পৌঁছত তা হলে আমাদের থিয়েটার আরও সবল হয়ে মাথা উঁচিয়ে নিজেকে নিজের জোরে এগিয়ে নিয়ে যেত। থিয়েটার চালানোর দায়ে দানের জন্যে দোরে-দোরে ঘুরতে হতো না। আমাদের মধ্যেও কোনও-কোনও দলের কোনও প্রযোজনা লেগে গেলে ওরা ভাবেন এমনটাই চলবে। এটাই চলার নিয়ম। দলের লেজা থেকে মুড়ো পর্যন্ত চাল চলন পাল্টে যায়, একটা দাম্ভিকতা, নাক উঁচুভাব আসে—মধ্যবিত্তওয়ানার চূড়ান্ত প্রমাণ। তারপর যখন ব্যর্থতার সময় আসে হুড়মুড় করে তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। আসলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব। এই থিয়েটার নিয়ে শুধুমাত্র সফলই হয়ে যাব অথচ ব্যর্থতার ঝুঁকি নেব না এই মানসিকতা নিয়ে লড়াই-এর থিয়েটার করার জো নেই। আমাদের থিয়েটারে টান-টান সোজা মেরুদন্ডটা ছাড়া হারাবার কিছু নেই। নকলের মোহে মজে আমরা সেই একমাত্র সম্বল এবং সম্পদটাকেই দুমড়ে-মুচড়ে নানান কসরৎ দেখাতে মগ্ন হই। এতে জাতও যায় পেটও ভরে না। প্রযোজনাতেও পরে অনিবার্য ভাবে এর প্রতিফলন এসে যায়।

অথচ আমাদের এই থিয়েটারে উৎপল দত্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, দেবাশিস মজুমদার, চন্দন সেন—এঁদের মতো বলিষ্ঠ নাটকাররা আছেন। যাঁদের কলমের

একটু মোচড়ে আমাদের সস্তা চটকদার না হয়েও গভীর অনুভূতি নিয়ে, বোধ নিয়ে আপামর সাধারণ দর্শকের মন স্পর্শ করতে পারে। দীর্ঘদিন সফল-অসফল নানান ব্যবসায়িক পারফরমিং মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফলদের মধ্যেও ওঁদের সমতুল্য ক্ষমতা নেই। এবার মনে হয় আমাদের নাট্যকারদের সামাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে গ্রুপ থিয়েটারকে ভিত্তি করেই ব্রিটিশ রেপার্টারির কেতায় পেশাদার সুস্থ থিয়েটার গঠন করা সম্ভব। নিশ্চয়ই সম্ভব—কারণ এখনও আমাদের এই থিয়েটারে বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়দের মতন প্রথম শ্রেণীর সংগঠক পরিচালকরা রয়েছেন। এঁরা যদি মনে করেন সুস্থ পেশাদার থিয়েটার গড়বেন তাহলে আমাদের থিয়েটারের রূপরেখা বদলে যাবে। নেশার সঙ্গে পেশার টান লাগলেই দীর্ঘদিনের অনেক আবর্জনা ঘুচে গিয়ে থিয়েটারের দুনিয়ায় নতুন ফুলের সৌরভ ছুটবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনওই হতাশ হই না, হইনি অনেক সময় নানান বিসদৃশ কাণ্ড দেখে বিরক্তি হয়ত বা ক্রোধও হয়। কিন্তু হতাশ নই। আমাদের এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন একটা চালে চলে গতি হারিয়েছে, চাল ফেরালেই গতি এবং জীবনীশক্তি আবার উদ্দাম হয়ে উঠবে। পৃথিবীর যে কোনও আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। তবে চাল ফেরাবার মুহূর্তে সচেতন থাকা উচিত, নইলে ঘরের চালে আগুন লাগতে পারে। নতুনভাবে বাঁচার জন্য এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। সকলের কাছে এখানকার সমস্ত থিয়েটার অনুরাগী কর্মীদের কাছে আমার একান্ত আবেদন: ভাবুন! নতুন করে ভাবুন! থিয়েটারের খোলা হাওয়ায় আবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিই। পুরনো দিনের মতোই না হয় প্রপ-বয় হয়ে আপনাদের সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াব।* □

---

* কথাটা শুনেই নিজের উরু চাপড়ে হাহা হাসিতে প্রায় ছাদ ফাটিয়ে 'যা বলেছেন মাইরি' বলে অজিতদা (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর অননুকরণীয় প্রাণশক্তি ভরা বিশাল শরীরটাকে দমকে-দমকে কাঁপাতে থাকতেন আর শিশুর মতো উচ্ছল আভায় তাঁর মুখটা ভরে যেত। যেত-ই। অজিতদার প্রস্থান আমার থিয়েটারকে, থিয়েটারের ভাবনাগুলোকে ফাঁকা করে দিয়েছে। ওঁর অভাব আজ ভীষণ অনুভব করি। এই মুহূর্তে ওঁকে প্রয়োজন ছিল। আমাদের থিয়েটারে ওইরকম একজন কর্মীর একান্ত, একান্ত প্রয়োজন।